চকবাজার ট্রাজেডী ও ফলোআপ

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, জাতীয় কমিটির সদস্য, সুজন

প্রায় এক মাসের কাছাকাছি হয়েছে চকবাজারের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনার। চকবাজার ও পাশ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় এখন অনেকেই নতুন করে দোকানপাট তৈরি করছে। আয় রোজগারের একমাত্র অবলম্বন হয়তো একটি দোকান। সেই দোকানটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবু জীবন থেমে থাকেনা। আবার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা।

তবে সবাই পুরোনো দোকান বা বাড়িতে ফিরতে পারছেনা। কারণ সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে অনেক বাড়ি বা ভবনে 'ঝুঁকিপূর্ণ' নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে। সেই ভবনে যাদেরই থাকার জায়গা বা ব্যবসা কেন্দ্র থাকুক না কেন সেখানে এখন বসবাস ও কাজকর্ম নিষিদ্ধ।

আপনারা জানেন সরকার ও বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ কেমিক্যাল গোডাউন ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ মালামাল শহরের বাইরে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছে। এবং সেই পরিকল্পনামত কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। তবে তা দুই পর্যায়ে হচ্ছে। প্রথমত একটি অস্থায়ী জায়গায় সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি স্থায়ী জায়গায় সরিয়ে নেয়া হবে। চকবাজার ও সংলগ্ন এলাকাকে ঝুঁকিমুক্ত করার জন্যে সরকার আরো নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিলম্বে হলেও এব্যাপারে সরকারের বোধোদয় ঘটেছে, এজন্যে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

চকবাজারের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা নাগরিক সমাজ কী করতে পারি? প্রথমেই স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশের মতো দুর্বল গণতন্ত্রের দেশে দল নিরপেক্ষ 'নাগরিক সমাজ' শক্তিশালী নয়। 'নাগরিক সমাজের' ব্যানারে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কয়েকটা প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে। তারা পরোক্ষভাবে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করে। সরকারের সমালোচনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দল নিরপেক্ষ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের অনেকে নানা কারণে কোনো ফোরামের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাঁরা শুধু কলাম লিখে এককভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন। অনেকে কলামও লেখেননা। কিছুই না করার চাইতে কলাম লিখে সরকারের দোষত্রুটি চিহ্নিত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এই কথাগুলো আজকের প্রসঙ্গে এজন্যে বললাম, নাগরিক সমাজের করণীয় আলোচনা করার সময় সংগঠনের শক্তি, লোকবল, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি বিষয় অনেকের মনে পড়বে।

এই মুহূর্তে নাগরিক সমাজের করণীয় অনেক। এখানে আমি প্রধান কয়েকটি কাজের কথাই শুধু বলবো। কাজগুলো ভালোভাবে করার জন্যে কয়েকটি কমিটি করে দিলে ভালো হয়। তাহলে কাজগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া যায়। যেমন: ১) সরকার পুনর্বাসনের জন্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা। বাস্তবায়নের পথে কী কী বাধা রয়েছে? পুনর্বাসনের জায়গা গুলো (অস্থায়ী) নিষ্কন্টক কীনা? গুদামের মালিকরা এখনই সেখানে গুদাম তৈরি করতে পারবে কিনা। সরকার অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সংযোগ দিয়েছে কিনা।

২) সরকার স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্যে যে জায়গা নির্ধারণ করেছে তা সরেজমিনে দেখা এবং সেখানে কী কী করণীয় রয়েছে তা সরকারকে জানানো। স্থায়ী পুনর্বাসনের ফলে আশেপাশের লোকালয়, আবাসিক এলাকা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে কিনা তা খতিয়ে দেখা। এব্যাপারে বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অবশ্যই নিতে হবে।

৩) সিটি কর্পোরেশন কয়েকটি বাড়িকে 'ঝুকিপূর্ণ' ঘোষণা করেছে। খুব ভালো উদ্যোগ, সন্দেহ নেই। এব্যাপারে বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে বলতে হবে আরো কিছু বাড়ি ঝুঁকিপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে কিনা। 'ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি' সম্পর্কে একশো ভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

৪) ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িগুলোর মালিক ও বসবাসকারীদের জন্যে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? তাদের জন্যেও কিছু একটা করতে হবে।

৫) নাগরিক সমাজের মূল কাজ হবে মনিটরিং ও পরামর্শ। সরকার বা বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ যা যা করছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা ও কোথাও গলদ দেখা দিলে তা জোরগলায় বলা।

৬) সম্প্রতি পুরোন ঢাকায় সরকারী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করছে। এই অভিযানের কোনো ভবনে দাহ্য পদার্থের কোনো কারখানা বা গুদাম পাওয়া গেলে তাৎক্ষনিকভাবে ঐ ভবনের সব সেবা সংযোগ বিছিন্ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকারি টাস্কফোর্স নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছেনা। বকশিবাজার সহ কয়েকটি জায়গায় স্থানীয় কিছু অধিবাসী টাস্কফোর্সের কর্মকর্তাদের কাজে বাধা দিচ্ছে। দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব সাঈদ খোকন এব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ম্যাজিস্ট্রেটরা আইনগতভাবে কাজ শুরু করেছেন। ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক কারখানার অস্তিত্ব পাওয়া গেলে তাঁরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এধরনের টাস্কফোর্স যেখানে বাধাগ্রস্থ হয় সেখানে উচ্ছেদের পক্ষে ও বাধাদানের সমালোচনা করে নাগরিক সমাজ স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে মানববন্ধন করতে পারে।

৭) চকবাজার, চুড়িহাট্টা ও সংলগ্ন এলাকায় যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তা নজিরবিহীন। কিন্তু পুরোন ঢাকায় শুধু এই এলাকাই ঝুঁকিপূর্ণ তা নয়। সমগ্র পুরোন ঢাকাই বিভিন্নভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। 'নাগরিক সমাজ' নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, স্থপতি, ব্যবসায়ী সমাজ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে 'পুরোন ঢাকা'র নতুন নকশা প্রণয়ন করতে পারে। ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণ করেই হতে হবে এই পরিকল্পনা। বলাবাহুল্য এটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। তারচেয়েও বড় কথা এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন সিগন্যাল থাকতে হবে। ঢাকা শহরে কেমিক্যাল গোডাউন সরাতেও 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের' প্রয়োজন হয়। অন্য কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের গোডাউন সরানোর ক্ষমতা নেই। পুরোন ঢাকার নতুন ডিজাইন করার জন্যে সিঙ্গাপুরের উদাহরণ টেনে আনা যায়। সিঙ্গাপুরে একসময় ঘিঞ্জি বসতি ছিল। তিন বা চারতলা ভবনে ৬০০ থেকে ৮০০ লোক বাস করতো। সরকার তাদেরকে কনভিন্স করে আট দশতলা বাড়ি করে দিল। মাঝখানে প্রচুর খোলা জায়গা। পুরোন ঢাকাকে নিয়ে এরকম চিন্তা করতে হবে।

৮) পুরোন ঢাকা সম্পর্কে কিছু তথ্য শেয়ার করলে আপনারা বুঝতে পারবেন পুরোন ঢাকা কীরকম। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তথ্য মতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পণ্য মজুদ করছে পুরোন ঢাকার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। শুধু ঢাকা মহানগরীতে এরকম প্রতিষ্ঠান ৮৬৭টি। এ তালিকায় আসে রাসায়নিক উপকরণ বিক্রেতা, প্রসাধন ও ওষুদ প্রস্তুতকারক, চামড়া ও ইস্পাত কারখানা, ডায়িং, ওয়াশিং, টেক্সটাইল শিল্পসহ বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠান। সদরঘাট এলাকাতেই রাসয়ানিক পণ্য মুজদকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩৬১টি। লালবাগ এলাকায় ৮৭টি, পোস্তগোলায় ৪৩টি, সিদ্দিকবাজারে ৪২টি। এগুলোর কোনটিরই অনুমোদন বা ছাড়পত্র নেই। (সুত্রঃ বণিক বার্তা, ২ মার্চ ২০১৯)

দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে গত দুই তিন দশকেও কোনো কাজ করেনি। তাদের কোনো জবাবদিহিতাও নেই। এব্যাপারে তাদের কেউ শাস্তি পায়নি। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ জনমত গঠন করতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। সিটি কর্পোরেশন ও রাজউককে দিয়ে কাজ করাতে পারে মন্ত্রণালয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় এব্যাপারে কখনো আগ্রহ দেখায়নি। মন্ত্রণালয় নির্বিকার হলে রাজউক ও সিটি কর্পোরেশন কখনো সক্রিয় হবেনা। রাজউকের নাকের ডগায় পুরোন ঢাকায় কেউ বিল্ডিং কোড মানছেনা, নকশার তোয়াক্কা করছেনা, আবাসিক বাড়িতে ব্যবসা বাণিজ্য চলছে, এগুলো দেখার কেউ নেই। হয়তো এব্যাপারে রাজউক কর্মকর্তার সঙ্গে বাড়ির মালিকের বাৎসরিক সমঝোতা হয়ে থাকে। সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গেও এধরণের সমঝোতা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এমনকি মন্ত্রণালয়েও এর ভাগ যাওয়া অসম্ভব কোনো ঘটনা নয়। এরকম সমঝোতা থাকলে আইন অমান্যকারীর ভয়ের কিছু নেই। আমি প্রায় নিশ্চিত চকবাজার বা সংলগ্ন এলাকাতে এরকম সমঝোতাই হয়েছে।

৯) নাগরিক সমাজ তাদের গবেষণা, সভা ও মানববন্ধনের মাধ্যমে উন্মোচন করতে পারে কোথায় কোথায় আইন লংঘিত হয়েছে বা আইনের প্রয়োগ হচ্ছেনা। নাগরিক সমাজ জোর গলায় বলতে পারে এব্যাপারে কারা দায়ি? কাদের অবহেলা ও নির্লিপ্ততার সুযোগে এরকম কাজ হতে পারে।

১০) জবাবদিহি আদায় করার আরেকটি ক্ষমতাবান সরকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি। ২০১০-এ নিমতলী দুর্ঘটনার পর ব্যাপক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে ১৭ দফা সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছিল তা বাস্তবায়ন হলোনা কেন? দুই শিল্প মন্ত্রী একে অপরকে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু তখন সংসদীয় কমিটির সদস্যরা কী করেছেন? তাঁরা কি মন্ত্রণালয়কে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে চাপ দিয়েছিলেন? তাঁরা কি ১৭ দফার বাস্তবায়ন মনিটরিং করেছেন? বাস্তব সত্য হল : তাঁরা কিছুই করেননি। গত সংসদের স্থানীয় সরকার ও পূর্ত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সদস্যদের নির্লিপ্ততার জন্যে আমরা নিন্দা করি। সত্যিকার অর্থে আমাদের সংসদীয় কমিটি গুলো তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে তেমন অবহিত নয়। আগ্রহীও নয়।

আমরা আশা করবো বর্তমান সংসদের দুই সংসদীয় কমিটি পুরোন ঢাকা নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করবে। এব্যাপারেও নাগরিক সমাজ মনিটরিং করতে পারে।

১১) নিমতলী দুর্ঘটনার পর যে ১৭ দফা সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছিল, যা বাস্তবায়িত হলে চকবাজার দুর্ঘটনা হতে পারতোনা। ১৭ দফা বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্যে দায়ি কারা? একটি কমিটি করে তাদের কি চিহ্নিত করা যায়না? তাদেরকে কি বিচারের সম্মুখীন করা যায়না? দোষীদের কি শাস্তি দেয়া যায়না? ৭০টি প্রাণের জন্যে যারা দায়ি তারা এভাবে বিনা বিচারে চলে যাবে? দোষী সরকারী কর্মকর্তাদের বিচার ও শাস্তি না হওয়ার জন্যে এদেশে দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও নির্লিপ্ততা বেড়ে গেছে। দোষী সরকারী কর্মকর্তাদের শাস্তির ব্যাপারে সরকারকে আরো ভাবনা চিন্তা করার জন্যে অনুরোধ করি। কোনো দায়িত্ব পালন না করলে যদি সরকারী কর্মকর্তার শাস্তি না হয় তাহলে চকবাজারের মতো আরো ঘটনা ঘটতে পারে।

১২) আগেই বলেছি, পুরোন ঢাকার নতুন নকশা বাস্তবায়ন করা অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু এখনই রাজউক ও সিটি কর্পোরেশন যা করতে পারে তা হল : রাজউকের প্ল্যান মাফিক যারা বাড়ি তৈরি করেনি বা ব্যবহার করেনি তাদের উচ্ছেদ করা বা নকশা অনুযায়ী বাড়ি পুন:নির্মাণ করতে সময় দেয়া। সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে আবাসিক বাড়িতে যারা বাণিজ্যিক কাজ করছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা। এসব এলাকায় ঝুঁকিহীন ছোটখাট বাণিজ্যিক কাজ করা যায়। সেজেন্য সিটি কর্পোরেশনের আলাদা অনুমতি নিতে হবে। রাজউক ও সিটি কর্পোরেশনকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আবাসিক বাড়ির নীচতলায়, শুধু

নীচতলায়, ঝুঁকিহীন সাদামাটা ব্যবসা কেন্দ্রকে বাড়িঅলা ভাড়া দিতে পারবে পুরোন ঢাকার বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। যেহেতু জমির স্বল্পতা, সরু রাস্তা ও আরো নানাবিধ কারণে পুরোন ঢাকায় পৃথকভাবে আবাসিক এলাকা ও বাণিজ্যিক এলাকা ভাগ করার এখন সুযোগ নেই। আবাসিক ভবনের নীচতলা যদি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাড়িঅলা ভাড়া দেয় তাহলে বাড়িঅলা, রাউজক কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা সকলেই দণ্ডিত হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ মনিটরিং করতে পারে।

১৩) এবার মিডিয়ার বন্ধুদের জন্যে দুএকটা কথা বলতে চাই। প্রথমত চকবাজার ট্রাজেডী তাঁরা যেভাবে কভার করেছেন, রিপোর্ট ও ছবিতে, তা অনবদ্য। এজন্যে তাঁদেরকে অভিনন্দন। মিডিয়ার কভারেজের জন্যে সরকার ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেছেন। তাই মিডিয়াকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। এই প্রসঙ্গে আমার একটা প্রস্তাাব : প্রত্যেক মিডিয়া হাউস তাদের একজন রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার/ক্যামেরাম্যানকে ২০১৯ সালের জন্যে চকবাজার সহ পুরোন ঢাকা কভারেজের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেবেন। তাদের দায়িত্ব হবে প্রতি সপ্তাহে একটি ফলোআপ স্টোরি ও ছবি তাদের মিডিয়াতে প্রকাশ/প্রচার করা। একজন প্রাক্তন রিপোর্টার হিসেবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এটা খুব কঠিন কাজ নয়। আমি শুধু চকবাজার নিয়ে ফলোআপ রিপোর্ট করার কথা বলছিনা। চকবাজার, নিমতলী, পুনর্বাসন এলাকা সহ সমগ্র পুরোন ঢাকার নানারকম ঝুঁকি নিয়ে রিপোর্ট করার কথা বলছি। এখনকার সাংবাদিক ও তাদের সম্পাদকরা আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন। তারা রিপোর্টারদের গাইড করতে পারবেন। মেয়র বা নানা সরকারী কর্মকর্তার খবরই একমাত্র খবর নয়। খবরের পেছনে অনেক খবর থাকে। সেগুলো বের করে আনতে হবে।

শেষকথা: চকবাজার ও এধরনের এলাকায় কী হচ্ছে তা নিয়ে জোরদার মনিটরিং করাই হবে নাগরিক সমাজের প্রধান দায়িত্ব। নাগরিক সমাজ সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা। কিন্তু সমাধান না হলে জোরগলায় প্রতিবাদ করতে পারবে। এই প্রতিবাদ যেন অব্যাহত থাকে। □

---

১৬ মার্চ, ২০১৯, 'সুজন' আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত।